ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা দ্রুতপঠনের জন্য

সুকুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৭

অলংকরণ :
সুকুমার রায়

প্রচ্ছদ :
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ২০১৩ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বলবৎ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সেই সূত্রে ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা দ্রুতপঠনের জন্য পুস্তক হিসেবে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে একটি গোটা গ্রন্থ 'হ য ব র ল'। প্রখ্যাত লেখক সুকুমার রায়ের এই গ্রন্থটিতে রয়েছে চিত্তাকর্ষক কল্পনার চমকপ্রদ সম্ভার। আশা করা যায়, দ্রুতপঠন বই হিসেবে 'হ য ব র ল' শিক্ষার্থীদের সমাদর পাবে। আশা করি, একটি গোটা বই পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন-সামর্থ্য যেমন বাড়বে, অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের ভাষা-সাহিত্য বোধও উন্নীত হবে।

এই বইটিও পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধি-র জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০১৭

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

S. Ray

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল, "ম্যাও!" কী আপদ! রুমালটা ম্যাও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটাসোটা লাল টকটকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাটপ্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

আমি বললাম, "কী মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।"

অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, "মুশকিল আবার কী? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।"

আমি খানিক ভেবে বললাম, "তা হলে তোমায় এখন কী বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।"

বেড়াল বলল, "বেড়ালও বলতে পারো, রুমালও বলতে পারো, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো।"

আমি বললাম, "চন্দ্রবিন্দু কেন?"

শুনে বেড়ালটা "তাও জানো না?" বলে এক চোখ বুজে ফ্যাচফ্যাচ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল।

আমি ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হলো, ওই চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, "ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, “হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর ‘চ’, বেড়ালের তালব্য ‘শ’, রুমালের ‘মা’—হলো চশমা। কেমন, হলো তো?”

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ-হুঁ করে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, “গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পারো।”

আমি বললাম, “বলা ভারী সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না?”

বেড়াল বলল, “কেন? সে আর মুশকিল কী?”

আমি বললাম, “কী করে যেতে হয় তুমি জানো?”

বেড়াল একগাল হেসে বলল, “তা আর জানি নে? কলকেতা, ডায়মন্ড হারবার, রানাঘাট, তিব্বত। ব্যস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হলো।”

আমি বললাম, “তা হলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পারো?”

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, “উঁহু, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তা হলে সে ঠিক ঠিক বলতে পারত।”

আমি বললাম, “গেছোদাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?”

বেড়াল বলল, “গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।”

আমি বললাম, “কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?”

বেড়াল খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “সেটি হচ্ছে না, সে হওয়ার জো নেই।”

এক চোখ বুজে ফ্যাচফ্যাচ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল

আমি বললাম, "কীরকম?"

বেড়াল বলল, "সে কীরকম জানো? মনে করো, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তা হলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হওয়ার জো নেই।"

আমি বললাম, "তা হলে তোমরা কী করে দেখা করো?"

বেড়াল বলল, "সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই, তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেবমতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে—"

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, "সে কী রকম হিসেব?"

বেড়াল বলল, "সে ভারী শক্ত। দেখবে কীরকম?" এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, "এই মনে করো গেছোদাদা।" বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, "এই মনে করো তুমি," বলে আবার ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, "এই মনে করো চন্দ্রবিন্দু।" এমনি করে খানিকক্ষণ কী ভেবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, "এই মনে করো তিব্বত" — "এই মনে করো গেছো বউদি রান্না করছে" — "এই মনে করো গাছের গায়ে একটা ফুটো"—।

এইরকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমায় কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, "দূর ছাই! কীসব আবোল তাবোল

বকছ, একটুও ভালো লাগে না।”

বেড়াল বলল, “আচ্ছা, তা হলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজো, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব করো।” আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচফ্যাচ করে হাসছে।

কী আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, “সাত দু-গুণে কত হয়?”

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হলো, “কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দু-গুণে কত হয়?”

তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক শ্লেট পেনসিল দিয়ে কী যেন লিখছে, আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, “সাত দু-গুণে চোদ্দো।”

কাকটা অমনি দুলে-দুলে মাথা নেড়ে বলল, “হয়নি, হয়নি, —ফেল।”

আমার ভয়ানক রাগ হলো। বললাম, “নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দু-গুণে চোদ্দো, তিন সাত্তে একুশ।”

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, “সাত দু’গুণে চোদ্দোর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল!”

আমি বললাম, ‘তবে যে বলছিলে সাত দু-গুণে চোদ্দো হয় না? এখন কেন?”

কাক বলল, “তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দো হয়নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দো আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়ে যেত—চোদ্দো টাকা এক আনা নয় পাই।”

আমি বললাম, “এমন আনাড়ি কথা তো কখনও শুনিনি। সাত দু-গুণে যদি চোদ্দো হয়, তা সে সবসময়েই চোদ্দো। একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশদিন পরে হলেও তাই।”

কাকটা ভারী অবাক হয়ে বলল, “তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?”

আমি বললাম, “সময়ের দাম কীরকম?”

কাক বলল, “এখানে কদিন থাকতে, তা হলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার জো নেই। এই তো কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটে সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।” বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময়ে হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কী যেন একটা সুড়ুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো, তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, আর মাথাভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কীসব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, “কই হিসেবটা হলো?”

কাক খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, “এই হলো বলে।”

বুড়ো বলল, “কী আশ্চর্য! উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনও হিসেবটা হয়ে উঠল না?”

কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, “কতদিন বললে?”
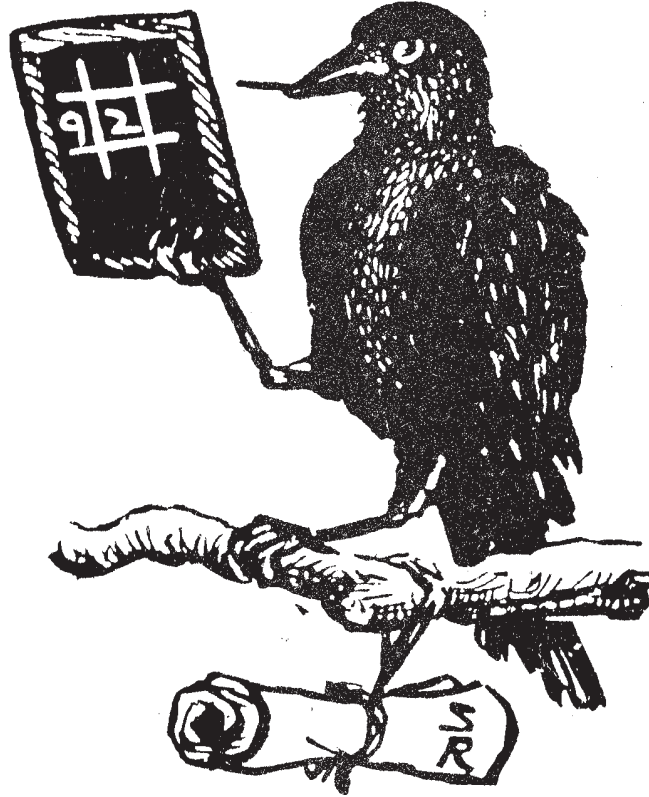
একটা দাঁড়কাক শ্লেট পেনসিল দিয়ে কী যেন লিখছে, আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

বুড়ো বলল, "উনিশ।"

কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, "লাগ লাগ লাগ কুড়ি।"

বুড়ো বলল, "একুশ।" কাক বলল, "বাইশ!" বুড়ো বলল, "তেইশ।" কাক বলল, "সাড়ে তেইশ।" ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।

ডাকতে-ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ডাকছ না যে?"

আমি বললাম, "খামখা ডাকতে যাব কেন?"

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখেনি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বনবন করে আট-দশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

তারপর হুঁকোটাকে দূরবিনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাঁচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বারবার দেখতে লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরোনো দরজির ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, "খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাত ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।"

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, "এ হতে পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুয়োর?"

বুড়ো বলল, "বিশ্বাস না হয়, দেখো।"

দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে
একটা হুঁকো, তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, আর মাথাভরা টাক।

তারপর বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, ‘‘ওজন কত?’’

আমি বললাম, ‘‘জানি না!’’

বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপেটিপে বলল, ‘‘আড়াই সের।’’

আমি বললাম, ‘‘সে কী, পটলার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোটো।’’

কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘‘সে তোমাদের হিসেব অন্যরকম।’’

বুড়ো বলল, ‘‘তা হলে লিখে নাও— ওজন আড়াই সের, বয়স সাঁইত্রিশ!’’

আমি বললাম, ‘‘ধুত! আমার বয়স হলো আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।’’

বুড়ো খানিক্ষণ কী যেন ভেবে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘বাড়তি না কমতি?’’

আমি বললাম, ‘‘সে আবার কী?’’

বুড়ো বলল, ‘‘বলি বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?’’

আমি বললাম, ‘‘বয়েস আবার কমবে কী?’’

বুড়ো বলল, ‘‘তা নয় তো কেবলই বেড়ে চলবে নাকি? তা হলেই তো গেছি! কোনদিন দেখব বয়েস বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি বছর পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কী!’’

আমি বললাম, “তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না?” বুড়ো বলল, “তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না— উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল— এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।” শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল— “তোমরা একটু আস্তে-আস্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চটপট সেরে নি।”

বুড়ো অমনি চট করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, “একটা চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।” এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকোতে চুলকোতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, “হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—

তারপর এদিকে বড়ো মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কী, ঘুমুতে-ঘুমুতে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি লোকলশকর সেপাই পল্টন হইহই রইরই মার-মার কাট-কাট—এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, ‘পক্ষীরাজ যদি হবে, তাহলে ন্যাজ নেই কেন?’ শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ‘ভালো কথা! ন্যাজ কী হলো?’ কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুড়সুড় করে পালাতে লাগল।”

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যান্ডবিল?”

আমি বললাম, “কই না—কীসের বিজ্ঞাপন?” বলতেই কাকটা একটা কাগজের বান্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। আমি পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে

৪১ নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবি ও বেহিসাবি খুচরা ও পাইকারি সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১ ।/ ০ । CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রং, কান কটকট করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! **সাবধান!!** **সাবধান!!!**

আমরা সনাতন বায়স বংশীয় দাঁড়ি কুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণির পাতিকাক, রামকাক প্রভৃতি নীচশ্রেণির কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাক বলল, “কেমন হয়েছে?”

আমি বললাম, “সবটা তো ভালো করে বোঝা গেল না।”

কাক গম্ভীর হয়ে বলল, “হ্যাঁ, ভারী শক্ত— সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল, তার ছিল টেকো মাথা—”

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, “দেখ! ফের যদি টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেবো।”

কাক একটু থতোমতো খেয়ে কী যেন ভাবল, তারপর বলল, “টেকো নয়, টেপো মাথা, —যে মাথা টিপে টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।”

বুড়ো তাতেও ঠান্ডা হলো না, বসে বসে গজগজ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, “হিসেবটা দেখবে নাকি?”

বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, “হয়ে গেছে? কই দেখি।”

কাক অমনি “এই দেখো” বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোটো ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে, “ও মা— ও পিসি— ও শিবুদা” বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, “লাগল নাকি! যাট-যাট।”

বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, “একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি—”

কাক বলল, ‘‘পঁয়ষট্টি।’’

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ‘‘কই হিসেবটা তো দেখলে না?’’

বুড়ো বলল, ‘‘হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই তো! কী হিসেব হলো পড়ো দেখি।’’

আমি শ্লেটখানা তুলে দেখলাম খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—

‘‘ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারত খেসারত দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখিলকার সত্ত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররি পত্তনিপাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফি আদালতে কিংবা দায়রায় সোপর্দ আসামি ফরিয়াদি সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিংবা আপোস মকমল ডিক্রিজারি নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—’’

আমার পড়া শেষ হতে না হতেই বুড়ো বলে উঠল, ‘‘এসব কী লিখেছ আবোল তাবোল?’’

কাক বলল, ‘‘ওসব লিখতে হয়। তা না হলে আদালতে হিসেব টিকবে কেন? ঠিক চৌকশ-মতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এসব বলে নিতে হয়।’’

বুড়ো বলল, ‘‘তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কী হলো তা তো বললে না।’’

কাক বলল, ‘‘হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে— ওহে, শেষদিকটা পড়ো তো?’’

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

‘‘সাত দু-গুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ২ l/ ০ ll সের, খরচ ৩৭ বৎসর।’’

কাক বলল, ‘‘দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল সি এমও নয়, জি সি এমও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তা হলে বাকি তিনটে হলো ত্রৈরাশিক।

এখন আমার জানা দরকার, তোমার ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও?"

বুড়ো বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও, তা হলে একবার জিজ্ঞাসা করে নি।" এই বলে সে নীচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, "ওরে বুধো! বুধো রে!"

খানিক পরে মনে হলো কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে উঠল , "কেন ডাকছিস?"

বুড়ো বলল, "কাক্কেশ্বর কী বলছে শোন।"

আবার সেইরকম আওয়াজ হলো, "কী বলছে?"

বুড়ো বলল, "বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ?"

তেড়ে উত্তর হলো, "কাকে বলছে ভগ্নাংশ? তোকে না আমাকে?"

বুড়ো বলল, "তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস না ত্রৈরাশিক?"

একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, "আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বলো।"

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "বুধোটার যেমন বুদ্ধি! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন? ভগ্নাংশটা খারাপ হলো কীসে? না হে কাক্কেশর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।"

কাক বলল, "তা হলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ গেলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, —তোমার হিসেব হলো আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে— খাঁটি হলে দু'টাকা চোদ্দো আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।"

বুড়ো বলল, "আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসাবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেট, আর এই নাও পয়সা ছটা।"

পয়সা পেয়ে কাকের মহাফুর্তি! সে 'টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম' বলে শ্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল।

তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, ‘‘ফের টাক টাক বলছিস? দাঁড়া! —ওরে বুধো, বুধো রে। শিগগির আয়। আবার ‘টাক’ বলছে।’’ বলতে না বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কী যেন হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নীচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে, ‘‘ওঠ বলছি, শিগগির ওঠ’’ বলে ধাঁই ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল।

কাক আমার দিকে চোখ মটকিয়ে বলল, ‘‘ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।’’

এই কথা বলতে বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁটলাসুদ্ধু উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়মড় করে বলল, ‘‘তবে রে ইস্টুপিড উধো!’’ উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, ‘‘তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো!’’

কাক বলল, ‘‘লেগে যা, লেগে যা—নারদ-নারদ!’’

অমনি ঝটাপট, খটাখট, দমাদম, ধপাধপ! মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছটফট করে টাকে হাত বুলোচ্ছে।

বুধো কান্না শুরু করল, ‘‘ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?’’

উধো কাঁদতে লাগল, ‘‘ওরে হায় হায়! আমাদের বুধোর কী হলো রে!’’

তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় চলে গেল।

আমি ভাবছি এইবেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কীরকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি মেরে দেখি, একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর,

প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না— খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, “এই গেল গেল— নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল!”

হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, “ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।”

আমি বললাম, “তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন?”

জন্তুটা বলল, “কেন হাসছি শুনবে? মনে করো, পৃথিবীটা যদি চ্যাপটা হতো, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—” এই বলে সে আবার হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, “কী আশ্চর্য! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ?”

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, “না, না শুধু এর জন্য নয়। মনে করো, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপিবরফ আর এক হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে— হোঃ হোঃ, হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—” আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, “কেন তুমি এইসব অসম্ভব কথা ভেবে খামোখা হেসে-হেসে কষ্ট পাচ্ছো?”

সে বলল, “না, না, সব কি আর অসম্ভব? মনে করো, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে— হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—”

জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার ভারী অদ্ভুত লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কী? তোমার নাম কী?”

সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, “আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্। আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার ভাইয়ের নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার বাবার নাম হিজি বিজ্ বিজ্, আমার পিসের নাম হিজি বিজ্ বিজ্ —”

একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর,প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না— খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, ‘‘এই গেল গেল— নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল!’’

আমি বললাম, ‘‘তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিসুদ্ধ সবাই হিজি বিজ্ বিজ্।’’

সে আবার খানিক ভেবে বলল, ‘‘তা তো নয়, আমার নাম তকাই। আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেসোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—’’

আমি ধমক দিয়ে বললাম, ‘‘সত্যি বলছ? — না বানিয়ে?’’

জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, ‘‘না না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।’’

আমার ভয়ানক রাগ হলো, তেড়ে বললাম, ‘‘একটা কথাও বিশ্বাস করি না।’’

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে একটা মস্ত দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘আমার কথা হচ্ছে বুঝি?’’

আমি বলতে যাচ্ছিলাম ‘না’ কিন্তু কিছু না-বলতেই তরতর করে সে বলে যেতে লাগল, ‘‘তা তোমরা যতই তর্ক করো, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে — ছাগলে কি না খায়।’’ এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

‘‘হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজি বিজ্ বিজ্, আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি. এ. খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার ‘ব্যা’ করতে পারি তাই আমার নাম ব্যাকরণ— আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরিজিতে লিখবার সময় লিখি B. A.অর্থাৎ ‘ব্যা’। কোন-কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোনটা-কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বলো — পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়, এটা অত্যন্ত অন্যায়। এই তো একটু আগে ওই হতভাগাটা বলছিল যে, রামছাগল টিকটিকি খায়! এটা এক্কেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি অনেকরকম টিকটিকি চেটে দেখেছি,
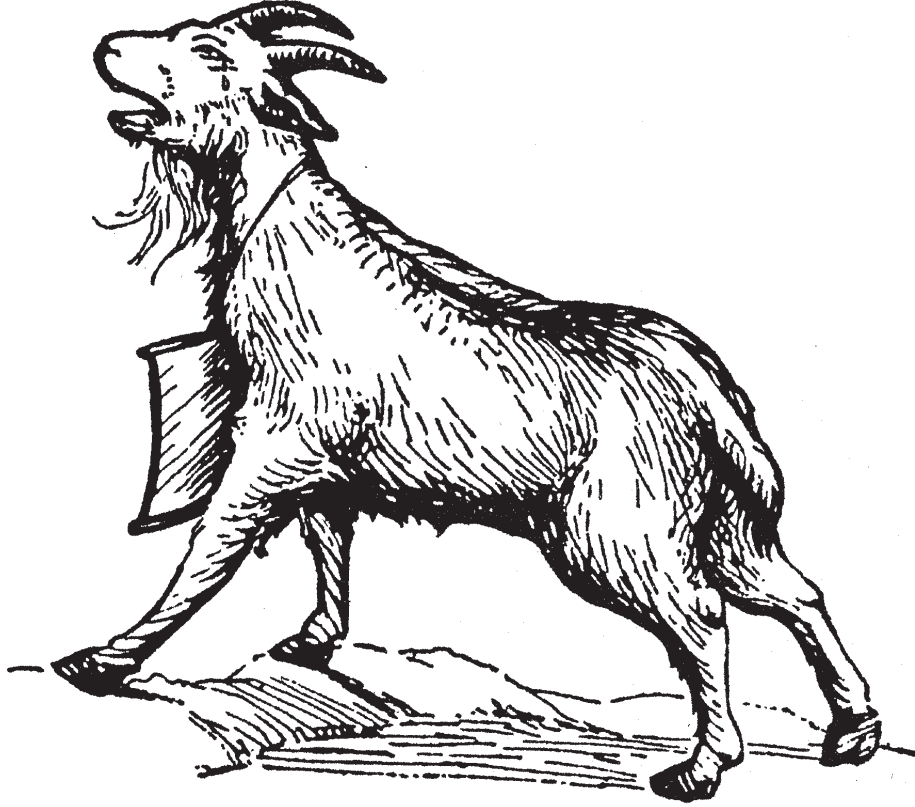
আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি. এ. খাদ্যবিশারদ।

ওতে খাবার মতো কিছু নেই। অবশ্যি আমরা মাঝে মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন — খাবারের ঠোঙা, কিংবা নারকেলের ছোবড়া, কিংবা সন্দেশের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কখনও খাই না। আমরা ক্বচিৎ কখনও লেপ কম্বল কিংবা তোশক বালিশ এসব একটু-আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিংবা টেবিল চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন শখ করে অনেকরকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিংবা চেখে দেখি, যেমন, পেনসিল রবার কিংবা বোতলের ছিপি কিংবা শুকনো জুতো কিংবা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার স্ফূর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাঁবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিংবা শিশি বোতল, এসব আমরা কোনোদিন খাই না। কেউ কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু সেসব নেহাত ছোটোখাটো বাজে সাবান। আমার ছোটোভাই একবার একটা আস্ত 'বার-সোপ' খেয়ে ফেলেছিল—" বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে 'ব্যা-ব্যা' করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে, সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে।

হিজি বিজ্ বিজ্‌টা এতক্ষণ পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাঁউ মাঁউ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির। আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার। কিন্তু একটু পরেই দেখি, সে আবার তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লেগেছে।

আমি বললাম, "এর মধ্যে আবার হাসবার কী হলো?"

সে বলল, "সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে-মাঝে এমন ভয়ংকর নাক ডাকাত যে, সবাই তার উপর চটা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম মারতে লেগেছে — হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—"

আমি বললাম, "যতসব বাজে কথা।" এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি একটা ন্যাড়ামাথা কে-যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে আমার গা জ্বলে গেল। আমায় ফিরতে দেখেই সে আবদার করে আহ্লাদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দু'হাত নেড়ে বলতে লাগল, "না ভাই, না ভাই, এখন আমায় গাইতে বোলো না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।"

আমি বললাম, "কি আপদ! কে তোমায় গাইতে বলছে?"

লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল, "রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি, রাগ করবার দরকার কী ভাই?"

আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর হিজি বিজ্ বিজ্টা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।" অমনি ন্যাড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুনগুন করতে করতে হঠাৎ সরু গলায় চিৎকার করে গান ধরল—"লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ।"

ওই একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দু'বার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল।

আমি বললাম, "এ তো ভারী উৎপাত দেখছি, গানের কি আর কোনোও পদ নেই?"

ন্যাড়া বলল, "হ্যাঁ আছে, কিন্তু সেটা অন্য একটা গান। সেটা হচ্ছে—'অলিগলি চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম।' সে গান আজকাল আমি গাই না। আরেকটা গান আছে—'নাইনিতালের নতুন আলু'—সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয়। সেটাও আজকাল গাইতে পারি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখিপাখার গান।"

একটা ন্যাড়ামাথা কে-যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এই বলেই সে গান ধরল—

‘মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশি বোতল ছিপি-ঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে,
সরু মোটা সাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।’

আমি বললাম, “এ আবার গান হলো নাকি? এর তো মাথামুন্ডু কোনো মানেই হয় না।” হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, “হ্যাঁ, গানটা ভারী শক্ত।”

ছাগল বলল, “শক্ত আবার কোথায়? ওই শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তা ছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না।”

ন্যাড়াটা খুব অভিমান করে বলল, “তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয়! অত কথা শোনাবার দরকার কী? আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না?” এই বলে সে গান ধরল—

‘বাদুড় বলে, “ওরে ও ভাই শজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।”

আমি বললাম, “মজারু বলে কোনো একটা কথা হয় না।”

ন্যাড়া বলল, “কেন হবে না—আলবত হয়। শজারু কাঙ্গারু দেবদারু সব হতে পারে, মজারু কেন হবে না?”

ছাগল বলল, “ততক্ষণ গানটা চলুক-না, হয় কি না হয় পরে দেখা যাবে।” অমনি আবার গান শুরু হলো—
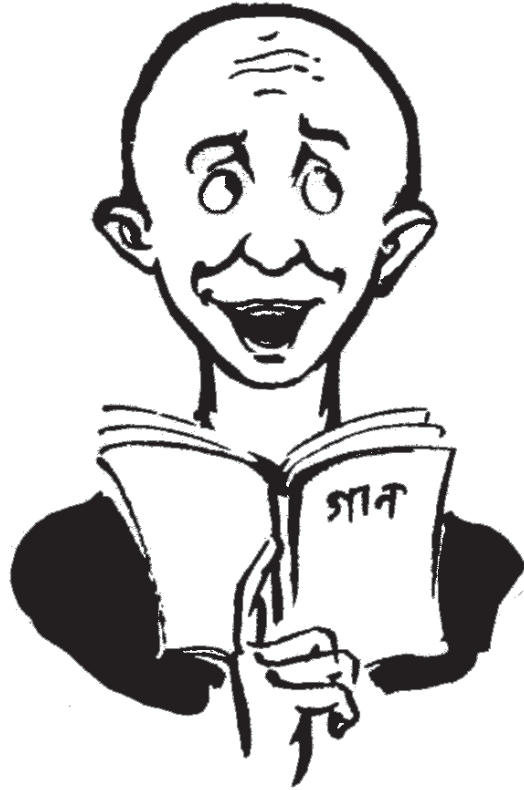
ওই একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দু'বার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল।

'বাদুড় বলে, "ওরে ও ভাই শজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু—
আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাংগুলো আর ব্যাঙাচি,
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,
দেখবে তখন ছিন্বি ছ্যাঙা চপাটি।"

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে নিলাম। গান চলতে লাগল —

'শজারু কয়, "ঝোপের মাঝে এখনি
গিন্নি আমার ঘুম দিয়েছেন দেখনি?
জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি,
ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।"
বাদুড় বলে, "পেঁচার কুটুম কুটুমি
মানবে না কেউ তোমার এসব ঘুঁতুমি।

ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?
গিন্নি তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদাড়ে।
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে
চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে।”

গানটা আরও চলত কিনা জানি না, কিন্তু এই পর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি আমার আশেপাশে চারিদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। একটা শজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শামলাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে-আস্তে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে আর ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, “কেঁদো না, কেঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।” হঠাৎ একটা তকমা-আঁটা পাগড়ি-বাঁধা কোলাব্যাং রুল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল — “মানহানির মোকদ্দমা।”

অমনি কোত্থেকে একটা কালো ঝোল্লা-পরা হুতোমপ্যাঁচা এসে সকলের সামনে একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে ঢুলতে লাগল, আর মস্ত ছুঁচো একটা বিশ্রী নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

প্যাঁচা একবার ঘোলা-ঘোলা চোখ করে চারিদিক তাকিয়েই তক্ষুনি আবার চোখ বুজে বলল, “নালিশ বাতলাও।”

বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো-কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিমচিয়ে পাঁচ-ছয় ফোঁটা জল বার করে ফেলল। তারপর সর্দিবসা মোটা গলায় বলতে লাগল, “ধর্মাবতার হুজুর। এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেকপ্রকার, যথা—মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, মুখিকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে, সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।

হঠাৎ একটা তকমা-আঁটা পাগড়ি-বাঁধা কোলাব্যাং রুল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল — ‘‘মানহানির মোকদ্দমা।’’

প্যাঁচা একবার ঘোলা-ঘোলা চোখ করে চারিদিক তাকিয়েই তক্ষুনি আবার চোখ বুজে বলল, ‘নালিশ বাতলাও।’

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শামলা মাথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, ‘‘হুজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুটকুট করে, কচুপোড়া খাও বললে মানুষ চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুয়োর আর শজারু। ওয়াক থুঃ।’’ শজারুটা আবার ফ্যাঁৎফ্যাঁৎ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাবড়া মেরে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘দলিলপত্র সাক্ষী টাক্ষি কিছু আছে?’’ শজারু ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘ওই তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।’’ বলতেই কুমিরটা ন্যাড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

‘একের পিঠে দুই চৌকি চেপে শুই পোঁটলা বেঁধে থুই
গোলাপ চাঁপা জুঁই ইলিশ মাগুর রুই হিন্‌চে পালং পুঁই
সান বাঁধানো ভুঁই গোবর জলে ধুই কাঁদিস কেন তুই?’

শজারু বলল, ‘‘আহা ওটা কেন? ওটা তো নয়’’। কুমির বলল, ‘‘তাই নাকি? আচ্ছা দাঁড়াও।’’ এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল —

‘চাঁদনি রাতের পেতনি পিসি সজনেতলায় খোঁজ না রে —
থ্যাঁতলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ ভোজ মারে।
চালতা গাছে আলতা পরা নাক ঝুলানো শাঁখচুনি
মাকড়ি নেড়ে হাঁকড়ে বলে, ‘‘আমায় তো কেঁউ ডাঁকছনি।
মুণ্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,
বলছে দুলে, মিনসেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।’’

শজারু বলল, “দূর ছাই! কী যে পড়ছে তার নেই ঠিক।”

কুমির বলল, “তা হলে কোনটা— এইটা?— ‘দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল’— এটাও নয়? আচ্ছা তা হলে— দাঁড়াও দেখছি—‘নিঝুম নিশুত রাতে, একা শুয়ে তেতালাতে, খালি খালি খিদে পায় কেন রে?’ — কী বললে? — ওসব নয়? তোমার গিন্নির নামে কবিতা? — তা, সে কথা আগে বললেই হতো! এই তো — ‘রামভজনের গিন্নিটা, বাপ রে যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনার্ঝন, কাপড় কাচে দমাদ্দম।’ — এটাও মিলছে না? তা হলে নিশ্চয় এটা—

‘খুসখুসে কাশি ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, ফুসফুসে ছ্যাঁদা বুড়ো তুই মর্।

মাজরাতে ব্যথা পাঁজরাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাত।”

শজারুটা ভয়ানক কাঁদতে লাগল, “হায়, হায়! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল! কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না!”

ন্যাড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, “কোনটা শুনতে চাও? সেই যে— বাদুড় বলে ওরে ও ভাই শজারু’—সেইটে?”

শজারু ব্যস্ত হয়ে বলল, “হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেইটে, সেইটে।”

অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, “বাদুড় কী বলে? হুজুর, তা হলে বাদুড়গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।”

কোলাব্যাং গাল-গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, “বাদুড়গোপাল হাজির?”

সবাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কোত্থাও বাদুড় নেই। তখন শেয়াল বলল, “তা হলে হুজুর, ওদের সক্কলের
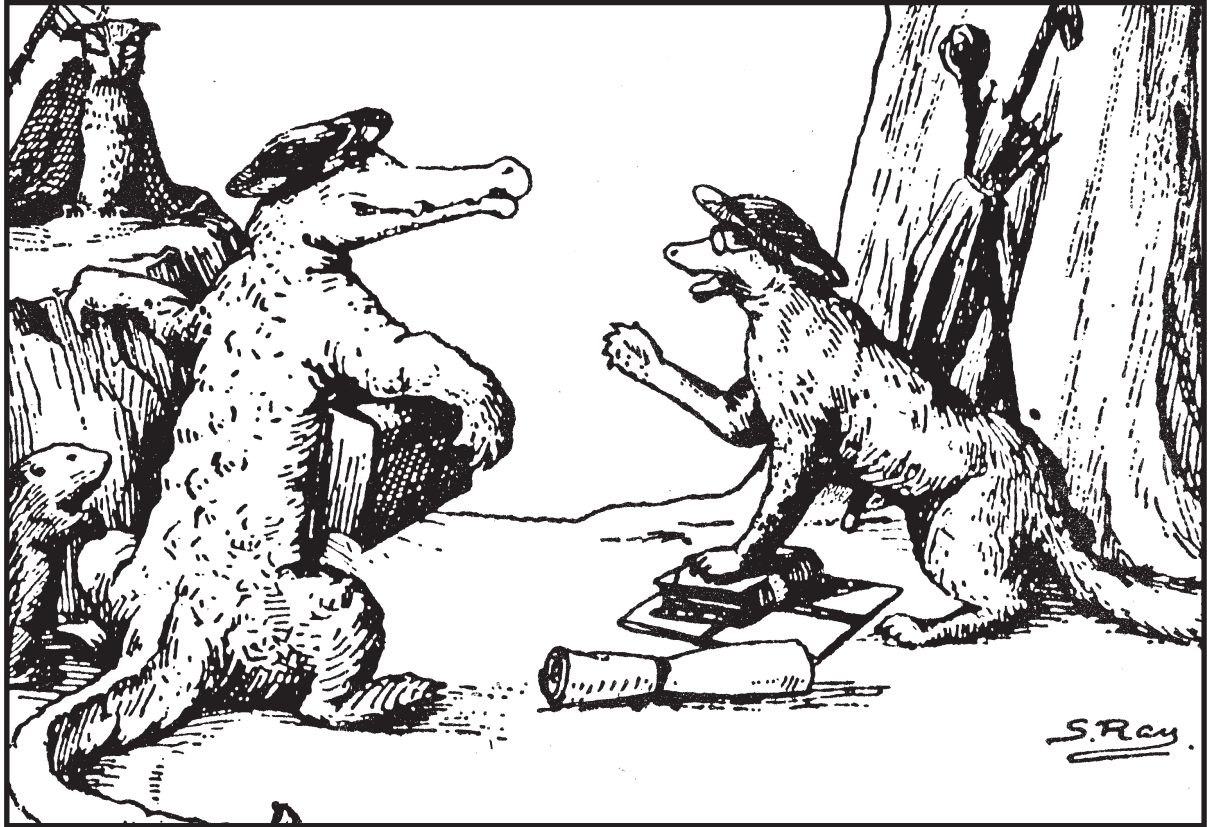
মানহানির মোকদ্দমা

ফাঁসির হুকুম হোক।”

কুমির বলল, “তা কেন? এখন আমরা আপিল করব?”

প্যাঁচা চোখ বুজে বলল, “আপিল চলুক! সাক্ষী আনো।”

কুমির এদিক ওদিক তাকিয়ে হিজি বিজি বিজ্‌কে জিজ্ঞাসা করল, “সাক্ষী দিবি? চার আনা পয়সা পাবি।” পয়সার নামে হিজি বিজ্‌ বিজ্‌ তড়াক করে সাক্ষী দিতে উঠেই ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ফেলল।

শেয়াল বলল, “হাসছ কেন?”

হিজি বিজ্‌ বিজ্‌ বলল, “ একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে, বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া আর মাথার উপর লাল কালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ‘তুমি আসামিকে চেনো?’ অমনি সে বলে উঠেছে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ।’ — হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।”

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, “তুমি শজারুকে চেনো?”

হিজি বিজ্‌ বিজ্‌ বলল, “হ্যাঁ, শজারু চিনি, কুমির চিনি, সব চিনি। শজারু গর্তে থাকে, তার গায়ে লম্বা-লম্বা কাঁটা, আর কুমিরের গায়ে চাকা-চাকা ঢিপির মতো, তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।” বলতেই ব্যাকরণ শিং ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে উঠল।

আমি বললাম, “আবার কী হলো?”

ছাগল বলল, “আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।”

আমি বললাম, “গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ করো।”

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, “তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জানো?”

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, “তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামি। তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে! আর একজন জজ থাকে, সে বসে-বসে ঘুমোয়।”

প্যাঁচা বলল, “কখ্খনো আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।”

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, “আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।” বলেই সে ফ্যাক ফ্যাক করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, “আবার কী হলো?”

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, “একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল ‘অবিমৃষ্যকারিতা’, তার ছাতার নাম ছিল ‘প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব’, তার গাড়ুর নাম ছিল ‘পরমকল্যাণবরেষু’ — কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়’ অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। —হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।”

শেয়াল বলল, “বটে? তোমার নাম কী শুনি?”

সে বলল, “এখন আমার নাম হিজি বিজ্ বিজ্।”

শেয়াল বলল, “নামের আবার এখন আর তখন কী?

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, “তাও জানো না? সকালে আমার নাম থাকে ‘আলু নারকোল’ আবার আর একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে ‘রামতাড়ু’।”

শেয়াল বলল, “নিবাস কোথায়?”

হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, “কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে গিয়েছে।” অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উধো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, “তা হলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে!”

উধো বলল, “দেশে গেলেই লোকেরা সব হুসহুস করে মরে যায়।”

বুধো বলল, “হাবুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।”

শেয়াল বলল, “আঃ, সবাই মিলে কথা বোলো না, ভারী গোলমাল হয়!”

শুনে উধো বুধোকে বলল, “ফের সবাই মিলে কথা বলবি তো তোকে মারতে-মারতে সাবাড় করে ফেলব।” বুধো বলল, “আবার যদি গোলমাল করিস তা হলে তোকে ধরে এক্কেবারে পোঁটলা-পেটা করে দেবো।”

শেয়াল বলল, “হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।”

শুনে কুমির রেগে লেজ আছড়িয়ে বলল, “কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।” বলেই সে তক্ষুনি ঠকঠক করে যোলোটা পয়সা গুনে হিজি বিজ্ বিজের হাতে দিয়ে দিল।

অমনি কে যেন ওপর থেকে বলে উঠল, “১নং সাক্ষী, নগদ হিসাব, মূল্য চার আনা।” চেয়ে দেখলাম কাক্কেশ্বর বসে-বসে হিসেব লিখছে।

শেয়াল আবার জিজ্ঞাসা করল, “তুমি এ বিষয়ে আর কিছু জানো কিনা?”

হিজি বিজ্ বিজ্ খানিক ভেবে বলল, “শেয়ালের বিষয়ে একটা গান আছে, সেইটা জানি।”

শেয়াল বলল, “কী গান শুনি?”

হিজি বিজ্ বিজ্ সুর করে বলতে লাগল, "আয়, আয়, আয়, শেয়ালে বেগুন খায়, তারা তেল আর নুন কোথায় পায়"

—বলতেই শেয়াল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, "থাক-থাক, সে অন্য শেয়ালের কথা, তোমার সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।"

এদিকে হয়েছে কী, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কাক্কেশ্বর ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, "শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ। শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি। আমরা হিসাবি ও বেহিসাবি খুচরা ও পাইকারি সকলপ্রকার গণনার কার্য—।"

শেয়াল বলল, "বাজে কথা বলো না, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। কী নাম তোমার?"

কাক বলল, "কী আপদ! তাই তো বলছিলাম — শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে।"

শেয়াল বলল, "নিবাস কোথায়?"

কাক বলল, "বললাম যে কাগেয়াপটি।"

শেয়াল বলল, "সে এখান থেকে কতদূর?"

কাক বলল, "তা বলা ভারী শক্ত। ঘণ্টা হিসেবে চার আনা, মাইল হিসেবে দশ পয়সা, নগদ দিলে দুই পয়সা কম। যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।"

শেয়াল বলল, "আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ি যাওয়ার পথটা চেনো তো?"

কাক বলল, "তা আর চিনি নে? এই তো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।"

শেয়াল বলল, "এ-পথ কতদূর গিয়েছে?"

কাক বলল, “পথ আবার যাবে কোথায়? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক-ওদিক চরে বেড়ায়? না, দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে যায়?”

শেয়াল বলল, “তুমি তো ভারী বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ, মোকদ্দমার কথা কী জানো?”

কাক বলল, “খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে-বসে হিসেব করল কে? যা কিছু জানতে চাও আমার কাছে পাবে। এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে কচুরি। কচুরি চারপ্রকার — হিঙে কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবেগজা! খেলে কী হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুট্‌কুট্ করে, কিন্তু কাগেদের করে না। তারপর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত, তার কানের চামড়া নীল হয়ে গেল — তাকে বলে কালাজ্বর। তারপর একজন লোক ছিল সে সকলের নামকরণ করত — শেয়ালকে বলত ‘তেলচোরা’, কুমিরকে বলত ‘অষ্টাবক্র’, প্যাঁচাকে বলত ‘বিভীষণ’ —” বলতেই বিচারসভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে টপ্ করে কোলাব্যাংকে খেয়ে ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল, শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস হুস করে কাক্কেশ্বরকে তাড়াতে লাগল।

প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, “সবাই এখন চুপ করো, আমি মোকদ্দমায় রায় দেব।” এই বলেই সে একটা কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, “যা বলছি লিখে নাও : ‘মানহানির মোকদ্দমা, চব্বিশ নম্বর। ফরিয়াদি—শজারু। আসামি— দাঁড়াও। আসামি কই?” তখন সবাই বলল, “ওই যা! আসামি তো কেউ নেই।” তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে ন্যাড়াকে আসামি দাঁড় করানো হলো। ন্যাড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামিরাও বুঝি পয়সা পাবে। তাই সে কোনো আপত্তি করল না।

হুকুম হলো—ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ 'ব্যা-করণ শিং' বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারিদিকে কীরকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, ''ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে-পড়ে ঘুমোনো হচ্ছে?''

আমি তো অবাক! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম—কিন্তু, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রুমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রুমাল নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই খচ্‌মচ্‌ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাগানের পিছন থেকে একটা ছাগল 'ব্যা' করে ডেকে উঠল।

আমি বড়োমামার কাছে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু বড়োমামা বললেন, ''যা, যা, কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।'' মানুষের বয়স হলে এমন হোঁৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনও বেশি বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।
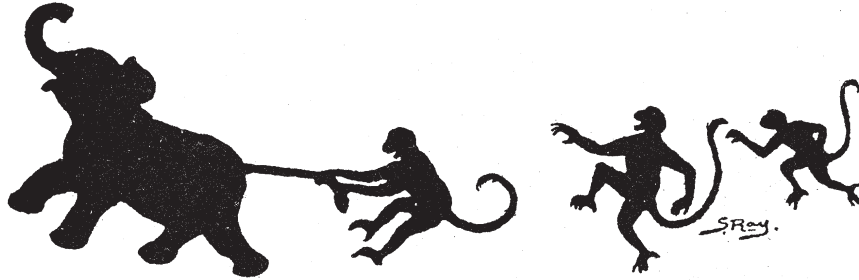
১. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

১.১ কোথায় রুমালটা বেড়াল হয়ে গিয়েছিল ?

১.২ শেষ পর্যন্ত সে কোথায় চলে গেল?

১.৩ কে চেঁচিয়ে বলেছিল, ‘মানহানির মোকদ্দমা’?

১.৪ কার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসির হুকুম হলো?

১.৫ কাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না সে ‘মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত’?

২. **নীচের শূন্যস্থান পূরণ করো এবং পূরণ করা শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা করো :**

২.১ আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি.এ. ________।

২.২ তার সুতোর নাম ছিল ________, তার ছাতার নাম ছিল ________, তার গরুর নাম ছিল ________ কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে ________ অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে।

২.৩ কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাবড়া মেরে জিজ্ঞাসা করল, ‘________ কিছু আছে’।

২.৪ মানহানির ________, চব্বিশ নম্বর।

২.৫ আমি বললাম, 'কই না, কীসের ______?'

২.৬ পয়সার নামে হিজি বিজ্ বিজ্ তড়াক করে ______ দিতে উঠেই ফ্যাকফ্যাক করে হেসে ফেলল।

২.৭ মস্ত ছুঁচো একটা ______ নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

২.৮ শজারু কাঙ্গারু দেবদারু সব হতে পারে, ______ কেন হবে না?

২.৯ ইমারত খেসারত ______ দস্তাবেজ।

২.১০ হুজুর, তাহলে ______ সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।

৩. **বিশদে উত্তর দাও :**

৩.১ হিজি বিজ্ বিজ্ কে? তার একটি গল্প নিজের ভাষায় লেখো।

৩.২ কাক্কেশ্বর কুচকুচে কোথায় থাকে? তার পরিচয় কী?

৩.৩ উধো আর বুধোর কীর্তিকলাপ নিজের ভাষায় লেখো।

৩.৪ হ য ব র ল - বইটির নাম এরকম কেন? তোমার কি নামটি ভালো লেগেছে? ভালো বা মন্দ লাগার কারণ জানাও।

৩.৫ হ য ব র ল বইটিতে কোন চরিত্রকে তোমার সবথেকে ভালো লেগেছে? কেন ভালো লাগল, সে বিষয়ে বলো।